প্রকৃত শিক্ষা বলতে কী বোঝায়

ছোটবেলায় গানের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল। একটা গানের কলি এরকম শুনেছিলাম: 'খোকনসোনা বলি শোনো, থাকবে না আর দুঃখ কোনো, মানুষ যদি হতেই পারো।' খোকনসোনা-খুকুসোনাদের মা-বাপ এমন করেই তাঁদের সোনামণিদের নিয়ে অনেক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখে থাকেন। কখনো-সখনো সে-স্বপ্ন বাস্তবেও রূপ নেয়। আবার অনেক সময় সোনামণি বড় হয় বটে, মানুষরূপী মানুষই রয়ে যায়– মানুষের মতো মানুষ হয় না। লালন গেয়েছিলেন, 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন।' মানুষের মধ্যে এই 'মানুষ-রত্ন' জেগে না উঠলে পরিবেশভেদে সে অমানুষ হয়, কখনো মানুষ নামের কলঙ্ক হয়, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। আরেকজন শিল্পী গেয়েছিলেন, 'এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই, মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই, এই মানুষের ভীড়ে আমার সেই মানুষ নাই।' শিল্পীর মনের হতাশা কি বাস্তবতার প্রতিফলন? আসলেই কি দিন দিন মানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনার গণ্ডি সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে? স্বার্থপরতা বেড়ে যাচ্ছে? হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জুলুম, খুনোখুনি, দুর্বলের প্রতি সবলের আধিপত্য, প্রাবল্য ও কর্তৃত্ব, 'নরম কাঠে ছুতোরের বল' সীমালঙ্ঘন করছে? আত্মজিজ্ঞাসা, বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ব, উদারতা, লোকলজ্জা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি ক্রমশই যারপরনাই বিলীন হয়ে যাচ্ছে? 'সেই মানুষ' কোথায় গেল? কেন গেল? দায়বদ্ধতা কার? 'দুনিয়া বোঝাই' মানুষ কি তাহলে অমানুষ?

আমরা বলি, প্রতিটা মানুষের মধ্যে মানুষ-রত্ন লুকিয়ে আছে। তাকে বের করে আনতে হয়, উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষা দিয়ে লালন করতে হয়, কাজে লাগাতে হয়। তারপর একটা মানুষ 'মানুষ' হয়। তাতে তার নিজের, সমাজের, দেশ ও দশের কল্যাণ হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রময় বসবাসে শান্তির সুশীতল ছোঁয়া অনুভূত হয়। উন্নতির চরম শিখরে উঠে বিশ্বসভায় জাতি-গোষ্ঠী মাথা উঁচু করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। উপযুক্ত সুশিক্ষার মাধ্যমেই কেবল মানুষকে প্রকৃত মানুষ, সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং জনসম্পদে পরিণত করা যায়, সুস্থ-সঠিক পথে চালানো যায়। শিক্ষা দরকার প্রথমত, নিজের সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনাবোধ, পরিশীলিত বিবেক ও সচেতনতা, মঙ্গল-অমঙ্গল বোঝা, পেশা নির্বাচন, আদর্শ পরিবার গঠন, ভালো মন্দ পৃথক করতে পারার ক্ষমতা অর্জনের জন্য; সুখ-শান্তিতে বসবাসের উপযুক্ত প্রগতিশীল সামাজ গঠনের জন্য; উন্নত চিন্তা ও সেবার মাধ্যমে আদর্শ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখার জন্য। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টির কল্যাণ ও স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবাদত, উপাসনা, প্রার্থনা করার জন্য। তৃতীয়ত, নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুকুমার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য।

প্রশ্ন, আমাদের দেশে কি সে-ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ আছে? বর্তমানে সরকার প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। এটা ভালো। এতে শিক্ষার মান ও গুণগত পরিবর্তন কতটুকু হবে, প্রশ্ন থেকে যায়। শিক্ষার মান অনেকটাই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সরকারকে এদিকটা বেশি করে ভাবতে হবে। জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মানবতাবোধ-জাগানিয়া শিক্ষার দিকে যেতে হবে।

শিক্ষা এবং লেখা ও পড়া জানা বা অক্ষরজ্ঞান থাকা এক কথা নয়। মানুষ শেখে সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা– দুটোর মানই ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা। শিক্ষার

বর্তমান অবস্থা নিয়ে এ দেশের সচেতনমহল সম্যক অবহিত। অথচ এ অস্বস্তিকর অবস্থায় নির্বাক হয়ে কিংবা হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় একদম নেই। করণীয় করতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে; নইলে পরিণতি আরো ভয়াবহ হতে বাধ্য। সাধারণ স্কুল-কলেজের কথাই বলি। লেখাপড়ায় লেখাও নেই, পড়াও নেই। নেই চিন্তা করতে শেখা, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, মানবিকতা, দেশপ্রেম, সামাজিক মূল্যবোধ, সত্যের সাধনা, চিন্তাধারার উৎকৃষ্টতা, জানার পিপাসা, শিক্ষা নিয়ে ভাবুক মন, গভীর আত্মজিজ্ঞাসা বা অধ্যবসায়। আছে শুধু নোটবই-গাইডবই বিক্রি, মোসাহেবি আর টিউশনি। সাথে মুখস্ত কিছু উত্তর শিখে টিক-চিহ্ন দিয়ে উপর-ক্লাসে ওঠার ব্যবস্থা। আছে অলীক কল্পনা, সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তৃপ্ত ঢেঁকুর, বেকারত্ব, দলবাজির উদগ্র শ্লোগান, মনোবৈকল্য, মিথ্যার বেসাতি, ভোগবাদী মানসিকতা। শিক্ষা থেকে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা বিদায় নিয়েছে কেন?

এসব দোষ তো আর ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়ে পার পাওয়া যাবে না! বাপ-মায়ের দিকে, শিক্ষকদের দিকে, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে হবে। হাতে-গোনা অল্প কিছু ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেখে, কিংবা জ্ঞানার্জন করে– তা শেখে তার নিজের আগ্রহের কারণে, সচেতন বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, উপদেশ ও প্রেরণার কারণে। এগুলোতে আত্মপ্রসাদে তৃপ্তির ঢেঁকুর না তোলাই ভালো। ছেলে-মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়তে হয়, আবার শহর-গ্রাম নির্বিশেষে বাসায় টিউটর রেখে আলাদা তালিম নিতে হয়। লেখাপড়াটা আনন্দময় না হয়ে দুর্বিসহ ও ভীতিকর হয়ে ওঠে।

বর্তমান শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষকসুলভ অবস্থাও বেশ নাজুক। এটা তাঁদের অপকর্ম ও অপচিন্তার ফসল। শিক্ষকদের ইস্পাতকঠিন নৈতিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। অনেক শিক্ষক নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতি, ফাঁকিবাজী, অব্যবস্থা, বাতিল মতামতের প্রতি আনুগত্য, মোসাহেবি করে শিক্ষকতা পেশাকে সামাজিক অবস্থানের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জাত্যভিমানী শিক্ষাগুরুর মর্যাদা হারিয়েছে। এর প্রভাব সমগ্র জাতি ও শিক্ষাব্যবস্থার উপর পড়েছে। শিক্ষকদের আবার বেতনও কম, তাতে পেট চলে না। মেধাবীরা তাই শিক্ষকতা পেশায় আসতেও চান না। এ দেশে আদর্শ বৈশিষ্ট্যের শিক্ষকই-বা বর্তমানে ক-জন! এ প্রজাতির শিক্ষক ক্রমশই বিলুপ্তির পথে।

শিক্ষার মান নিম্নমুখী, নৈতিকতার মান আরো নিম্নমুখী। মানবিকতা ও সততার স্তর সর্বনিম্ন পর্যায়ে; বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। তাহলে শিক্ষার চিকিৎসকরা কি ভুল ব্যবস্থাপত্র বাতলাচ্ছেন? চিকিৎসা কি ব্যর্থ হতে চলেছে? আমরা কি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছি? এক্ষেত্রে জাতির ভবিষ্যৎ কী? এ জাতি কি তাহলে অন্য কোনো সম্প্রসারণবাদী ভিনদেশী গোষ্ঠীর গোলামি করে খাবে? শিক্ষার আলো না থাকলে বুনো গাঢ় আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাবে, এটাই প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।

মাদ্রাসা শিক্ষায়ও কয়েকটা ভাগ। কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা এবং মক্তব/নূরানি ও ফুরকানিয়া/হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এখানে সমগ্র জীবনে সৃষ্টি-স্রষ্টার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও জীবন-কর্ম শুধু পরকালের বেহেশত নসিবের সরু গলিতে আটকে গেছে। ধর্মটাকেই পুরো পেশা বানিয়ে ছেড়েছে। উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের শিক্ষা নেই বললেই

চলে। ভিন্ন কোনো উচ্চমানের পেশায় যাবারও প্রচেষ্টা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলমানদের সভ্যতা, ঈমান, বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যকে প্রাগ্রসর প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রগতিশীল না করে অজ্ঞতা ও চিন্তার বিকলতা দিয়ে পিছনের দিকে ফিরিয়ে আদিম যুগে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ সেখানেও অবিকশিত প্রতিভাবান ছেলে-মেয়ে রয়ে গেছে। কোনো ছাত্রছাত্রীই এ দেশের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, হিসাববিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবস্থাপক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিমানচালক ইত্যাদি শতেক পেশায় জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে না। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে বেকার বা ছদ্ম-বেকার। ইহকালের স্রষ্টা-সৃষ্টিসেবার কর্মই যে ইবাদত; কর্ম ছাড়া পরকাল যে অচল, তা বোঝে না বা বুঝতেও চায় না, কেউ বোঝায়ও না। দুনিয়া সৃষ্টি না হলে আখেরাত থাকে কী করে? কর্ম আছে বলেই কর্মফল আছে। কর্মের অস্তিত্ব না থাকলে ফল লাভ দুঃসাধ্য– এসব চিন্তা তাদের কাছে কল্পনাতীত। লেখাপড়ায় গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় পুরোপুরি অনুপস্থিত। অথচ মোনাজাত করে 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (সুরা বাকারা: ২০১)। মোনাজাতের গভীরতাকেও ভেবে দেখে না। যদি বলা হয়, দুনিয়ার কল্যাণ কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? তার পদ্ধতিই-বা কী? আখেরাতের কল্যাণের আগেই-বা দুনিয়ার কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেন? দুনিয়া আছে বলেই না আখেরাত আছে। ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কি আমরা সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত সামুদয়িক শিক্ষাকে আনতে পারিনে?

ইসলাম যদিও একটা 'বিজ্ঞানময় কোরআনের শপথ', প্রগতিশীল ধর্ম ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা; অধিকাংশ মৌলভিরা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত, অক্ষম– বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। দুনিয়ার কল্যাণ সৃষ্টি-সেবা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে এবং আখেরাতের কল্যাণ স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে কি-না আমরা অনুসন্ধান করে দেখছিনে কেন? ভুলেও এর গভীরতা নিয়ে গবেষণা করছিনে; বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে তলিয়ে দেখছিনে; সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ম ও সিস্টেম নিয়ে বেওয়াকেবহাল। মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস বলে– মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই স্থান দখল করে রেখেছিল। মুসলমানরা রসায়নবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ভূ-তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রপথিক হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রেখেছিল। হয়তো আমাদের এসব পড়ে দেখা ও জানার সময় নেই; পির-পূজা, কবর-পূজা, পেট-পূজা ও ফন্দি-পূজা, নেতৃত্ব-পূজা নিয়ে মহাব্যস্ত।

বিগত চল্লিশ বছরে মক্তব-মাদ্রাসা অনেক গুণ বেড়েছে। কোরআন-হাদিস পড়া, মিলাদ-মহফিল করা লোক অসংখ্য বেড়েছে, বেড়েছে শ্রোতার সংখ্যাও। সে-সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বেকারত্ব, ধান্দাবাজি, দলবাজি, ধর্মীয় সভায় বক্তার ফি। বাড়েনি সমাজে, অফিস-আদালতে কর্মরত সুস্থ চিন্তা-করা, জ্ঞানী-দূরদর্শী, কর্মঠ সৎমানুষের সংখ্যা– তাই পরিবেশ গেছে নষ্ট হয়ে। গলদটা কোথায়? মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের বিষয়টা আশু ভাবনার খোরাক। হালকা আবেগ ও গোঁড়ামি দিয়ে সুশিক্ষিত ও প্রাগ্রসর জাতি গড়া যায় না।

এ দেশের ধর্মকর্ম ও মাওলানাদের নিয়েও বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ কমে যাচ্ছে, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ ও শান্তি থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি, দেশে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের বড্ড অভাব দেখা দিচ্ছে। সমাজে হিংসা, হানাহানি, অনৈতিকতা নিত্য। ধর্মীয় উগ্রতা ও বিভাজন বেড়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে ভাবতে হবে। এ অবস্থা এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত থেকে সৃষ্ট। শিক্ষার ভিত্তিমূলে যার যে ধর্ম, তাকে সে ধর্ম সাধারণ শিক্ষার সাথে শিখতে হবে। ধর্ম থেকে আহরিত মানবতার ধর্ম জীবন চলার পাথেয় হিসেবে নিতে হবে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার কল্যাণে তা কাজে লাগাতে হবে। যার যেমন খুশি, উচ্চশিক্ষা কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ পেশায় জীবন পরিচালনা করবে।

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ছাড়াও আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, দুদক, নির্বাচন কমিশনের মতো অনেক সামাজিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশে আছে। এদের থেকেও মানুষ শিক্ষা নেয়, নেওয়াটাই উচিত। বর্তমান পরিবেশে এদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা না নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দূরে থাকাই শ্রেয় বলে মনে হয়। রাজনৈতিক সংগঠনও এক ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তাও এ দেশে জুতসই নয়। অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, ভাঁওতাবাজি, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, রাহাজানি, শোষণ, হত্যা, গুম, অন্তর্দলীয় কোন্দল ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কিংবা যুবসমাজের চরিত্র-গঠনমূলক ভালো কিছু শিক্ষা সেখান থেকে পাওয়ার আশা কালবোশেখি ঘনঘোর ঘনঘটার কাছে স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে-ভরা শান্তিময় পরিবেশ চাওয়ার শামিল। কোথায় শিক্ষা? যে যা-ই বলুক, সুশিক্ষিত-চেতনাবোধসমৃদ্ধ জনসম্পদ গড়া ছাড়া এ জাতির মুক্তির আমি তো আর কোনো বিকল্প পথ দেখিনে।

অনেক অসহনীয় ও আপত্তিকর কথা বলছি সত্য– সমাজের নির্মম বাস্তবতা বলেই বলছি। কিন্তু দোষটা আসলে স্কুল-কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসার না। দোষ আমাদের পথহারা চিন্তা-চেতনার, পদ্ধতি নির্বাচনের, প্রতিকূল পরিবেশের, অদূরদর্শিতার, সদিচ্ছার অভাবের। দরকার উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষার। সেজন্য স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাদ্রাসার অন্য নাম) মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পথ ও পদ্ধতি পরিশুদ্ধ এবং পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের মধ্যেই সুশিক্ষিত সদাজাগ্রত জনগোষ্ঠী তথা মানবসম্পদ তৈরির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ– তা আমাদেরকে মানতে হবে। এখান থেকে মানবসম্পদ তৈরি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেলে অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ক্রমশ প্রকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সুশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল-সচেতন জাতি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠবে। অন্যথায় এ জনগোষ্ঠীর পরনির্ভরশীল, সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী শোষকগোষ্ঠীর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাসত্ব বরণ করে দেশ ও জাতি হিসেবে ক্রমশ নিস্তেজ, নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়ও দেখি অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তিমান নেই– গোড়ায় গলদ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া সত্যি সত্যি শেখালে ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, বুঝতে পারে না। চাকরি বাঁচানোর প্রয়োজনে শিক্ষকদের বক্তৃতার মান নীচে নামাতে হয়। নম্বর অর্জন করতে পারে না, তবু নম্বর দিতে

হয়। নইলে লোম বাছতে কম্বল উজাড় হয়। ছাত্রছাত্রীরাও না শিখে, বেশি বেশি নম্বর পেয়ে সার্টিফিকেট পাওয়ার আনন্দে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে শিক্ষাঙ্গন ছাড়ে। আমিও সান্ত্বনার ঢেকুর তুলি বটে– সে ঢেকুর টক, অম্ল স্বাদযুক্ত, তেতো। আমিও আত্মপ্রবোধিত সন্তুষ্টি মনে মনে প্রকাশ করি, ছাত্রছাত্রীও কৃতার্থ হয়। অথচ সার্টিফিকেটের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিজেকে পেশাদার ফাঁকিবাজ বলে মনে হয়। মাঝখানে বিবেকের দংশন, আত্মাবমাননা, আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগী। 'ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না। যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

এ বিশ্বে বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদের অভাব নেই। মানবজাতির একটা অংশ কুরুচিশীল এবং বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন; এটা তো সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছে। এরা মনুষ্য প্রজাতিকে কিছু কিছু উদ্ভট-উদ্‌ভ্রান্ত মতবাদ দিয়ে অন্যান্য ইতর প্রাণির পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাতে চায়। এদের কাছে পুরো মানবসমাজ ও মানবসভ্যতা আত্মসমর্পণ করতে পারে না। এদের অনুপাত যত বাড়বে, বিশ্বশান্তি-স্থিতি ততো বিঘ্নিত হবে। তাই কোনো দ্ব্যর্থ-মতবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতা করা একেবারেই চলে না। এতে এ বিশ্বচরাচরে মানবজাতির সাবলীল ও সৃষ্টি-সেরা জীবনযাপন দুরূহ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ আস্তিক-নাস্তিক কিংবা সন্দিগ্ধমনা হলে কারো কিছু যায়-আসে না। এটাকে মেনে নেওয়াই ভালো। কিন্তু হালকা জ্ঞান দিয়ে যে কোনো ধর্মেরই খারাপ দিক নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি কখনোই ভালো না, বা কুৎসিত মন্তব্যও করা উচিত না। তা কেউ ধর্ম পালন করুক চাই না-করুক।

আরেকটা কথা প্রায়ই বলি। উন্নয়ন কথাটা ভাবার আগে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নের কথাটা আগে চলে আসা দরকার। শিক্ষার উন্নয়ন মানে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন, যদি জনগোষ্ঠী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। নইলে নির্মাণকাজে রডের ব্যবহারের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহার, একটা বালিশ উপরতলায় উঠাতে হাজার টাকার কাছে ব্যয় এবং এমনই শত-সহস্র বাস্তব ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে অবতারণা করা যাবে। আমি উন্নয়ন বলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে বুঝিনে; কোনো দেশে বসবাসরত আপামর জনগোষ্ঠীর মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ততাকে বুঝি। এরপর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করলে তা হয় টেকসই উন্নয়ন। ইস্পাত ছাড়া যেমন খালি লোহার ছুরি অচল, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া মানসিক উন্নয়নের প্রশস্ত পথের ভাবনাও অবান্তর। আগে জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সে-সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়নসহ শতেক বহুমুখী উন্নয়ন চলুক। তখন জাতীয় সম্পদের অপব্যয়, অপচয় এত বেশি হবে না, সিস্টেম লসও সীমা ছাড়াবে না। কারণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সুনীতির একজোড়া উন্নত হাত আর কুটিল বুদ্ধিতে ভরা চোরা হাত কোনোক্রমেই এক হতে পারে না। আমরা দেশের টাকা খরচ করে কৌশলী চোর-ডাকাত কিংবা কুখ্যাত পকেটমার কোনোভাবেই তৈরি করার পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিতে পারিনে।

পেশাগত কারণে অনেক সময়ই বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্সে যেতে হয়, নানা জনের নানান কথা শুনতে হয়, বলতে হয়। দেখেছি, যিনি যে দেশে লেখাপড়া করে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই সে-দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক

বুনন, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, লেখাপড়ার সিলেবাস হুবহু নকল করে, কপি অ্যান্ড পেস্ট করে এ দেশে চালু করে দেশকে সে-দেশ বানাতে চান, উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবার নুশকা বাতলান। আমি বরাবরই এতে দ্বিমত পোষণ করি। পশ্চিমা সভ্যতার হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে এ দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজ খুব ভোগবাদ-ক্লান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত, জীবনের উদ্দেশ্য-বিভ্রান্ত এবং নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্তঃসারশূন্য গন্তব্যের পিছনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে তারা দিশেহারা। তাদের মধ্যে দেশীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশি বাঙালি আজীবন এদেশীয় বাঙালি। প্রতিটা জাতির নির্দিষ্ট কিছু স্বকীয়তা রয়েছে; রয়েছে আলাদা সংস্কৃতি, সামাজিক বুনন, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা। অন্য কোনো দেশের ভালো কিছু থাকলে সেটা আমরা আত্মস্থ করতে পারি, দেশের উপযোগী করে গ্রহণ করতে পারি। নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দিতে পারিনে। জাতি গঠনে এটাও একটা শিক্ষা। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী তার অস্তিত্ব রক্ষায় এবং ক্রমবিকাশ সাধনে নিজস্ব সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, দেশীয় মূল্যবোধ, আত্মোন্নয়ন ও দেশ-গড়ার উপযোগী শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক– এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

(৬ আগষ্ট ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক